রুশ বিপ্লবের ১০০ বছর-২

সোভিয়েত ইউনিয়নকাল ও সোভিয়েত-উত্তর বিশ্ব

আনু মুহাম্মদ

লেনিন যে রুশ বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা জন্ম দিয়েছিল প্যারী কমিউনের পর বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ক্রমে অনেকগুলো জাতি-রাজ্য একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক' বা সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই নতুন ইউনিয়ন গঠনের পর শুধু যে তা ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সমাজ অর্থনীতির একটি মৌলিক পরিবর্তন করেছিল তা-ই নয়, সারা বিশ্বের মানুষের সামনে উন্নততর মানবিক সমাজের একটি কাঠামোও উপস্থিত করেছিল। কেন এর পতন হলো? এই সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান জগতে কী পরিবর্তন আনলো আর তার পতনে কাদের বিজয়যাত্রা আরও শক্তিশালী হলো? এসবের পর্যালোচনাই রুশ বিপ্লবের ১০০ বছর নিয়ে ধারাবাহিক লেখার দ্বিতীয় পর্বের মূল বিষয়।

মার্কস বিশ্লেষণ করেছিলেন কীভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের জীবন, তার জগৎ, প্রাণপ্রকৃতি, এমনকি তার মেধা, মনন, শরীর পুঁজি দখল করে, নিজের মতো করে মুচড়িয়ে নেয় বাজার উপযোগী করতে। দাসত্ব, শৃঙ্খলকে মোহময় চাদর দিয়ে ঢেকে রাখে, মুনাফার দামামায় মানুষ হয়ে পড়ে তুচ্ছ। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানুষ থেকে। মানবিকতা, সামষ্টিক বোধ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। অক্টোবর বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি ছিল, তা মানুষকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে আনবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাকালে বাকি পুঁজিবাদী বিশ্ব ছিল প্রধানত উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বিভক্ত। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বেশির ভাগ অঞ্চল ছিল উপনিবেশ বা প্রায় উপনিবেশ। রুশ বিপ্লব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম এবং ক্রমে একটি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের উদ্ভব এই পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিভিন্ন উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশসহ নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তির সংগ্রামে রুশ বিপ্লব হয়ে ওঠে বড় প্রেরণা এবং সরাসরি ভূমিকা পালন না করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিপীড়িত জাতি ও মানুষের লড়াইয়ে সাহস হিসেবে কাজ করতে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলো কেন?

সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমে নিজের ভেতর নিজে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, আমলাতান্ত্রিকতায় আড়ষ্ট হয়েছে, কর্তৃত্বমুখী ব্যবস্থার কারণে ব্যক্তিমালিকানার নতুন ধরন তৈরি হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরেই নতুন মালিক ও শাসক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। খেয়াল করতে হবে যে তা হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামোর মধ্যে, পার্টির নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়েই। এই বিষয়ের দিকেও আমাদের বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে যে বিপ্লবের পর অর্থাৎ বিপ্লব-উত্তর সমাজে যদি নতুনভাবে শ্রেণীস্বার্থের উদ্ভব ঘটে, যদি বৈষম্য সৃষ্টির ব্যবস্থা বাড়তে থাকে, যদি ব্যক্তিমালিকানার প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে, যদি জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা উত্তরোত্তর শৃঙ্খল হিসেবে রূপ নিতে থাকে তাহলে সমাজতন্ত্রের মূল ধারণাই আঘাত পেতে থাকে। এর সবই সমাজতন্ত্রের কাঙ্ক্ষিত মুক্ত জীবনের লক্ষ্যে যাত্রার ধারণার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।

দুর্নীতি, বৈষম্য ও নিপীড়ন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, এগুলো ছাড়া পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু এসব উপাদানের সঙ্গে সামাজিক মালিকানা, সামাজিক কর্তৃত্ব, ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র নামের যে সমাজব্যবস্থা, তার সন্ধি চলে না। সে কারণে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ হলেও যদি সেই সমাজে কোনো না কোনো কারণে বৈষম্য, নিপীড়ন বা দুর্নীতির প্রভাব বা উপস্থিতি বাড়তে বাড়তে তা মূলধারাকে গ্রাস করে তাহলে সেই সমাজ টিকতে পারে না, সেখানে পুঁজিবাদের অনুকূল ব্যবস্থারই বিকাশ ঘটতে বাধ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে সেটাই হয়েছে।

কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটল? তবে কি পুঁজিবাদই মানব ইতিহাসের শেষ পর্যায়? তবে কি বৈষম্য ও নিপীড়নই মানুষের জন্য স্বাভাবিক নিয়ম বা প্রাকৃতিক বিধি? এর বিবিধ, কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা আছে।[১] এখানে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলা যায় যে প্রথমত, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা অবস্থা, একটি দেশে পাল্টা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ রকম অবস্থায় তার অন্তর্গত ক্ষমতার যথাযথ বিকাশও সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, বৈষম্য নিপীড়ন শ্রেণীস্বার্থভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে মুক্তির লড়াই মানুষের দীর্ঘকালের। বিভিন্ন পর্বে এর সুদূরপ্রসারী সাফল্যও আছে। আবার আছে পশ্চাদপসরণও। এই যাত্রা সরলরৈখিক নয়, এর অনেক আঁকাবাঁকা পথ আছে। মানুষের ইতিহাসে কোনো নতুন ব্যবস্থা, এমনকি সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণেও বারবার পশ্চাদপসরণ দেখা গেছে। কয়েকশ বছরের ওঠানামার পরই কেবল প্রাক-পুঁজিবাদী নানা ব্যবস্থার ওপর পুঁজিবাদ নিজের বিজয় নিশ্চিত করতে পেরেছে। তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্র কখনো জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া বিকশিত হতে পারে না। মানুষ যদি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, রাষ্ট্র যদি কর্তৃত্বমুখী হয়, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র দিয়ে যদি পার্টি ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাহলে সেখানে সমাজতন্ত্রবিরুদ্ধ শক্তির বিকাশ ঘটতে বাধ্য।

ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক সমাজ থেকে বের হয়ে বিকশিত সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সচেতনভাবে বিপ্লব সংঘটিত করা এবং বিপ্লব-উত্তর সমাজ নির্মাণের এই অভিজ্ঞতা ছিল মানুষের ইতিহাসে নতুন। এগুলো আমাদের শিক্ষা। মার্কস এঙ্গেলস পুঁজিবাদকে বিশ্লেষণ করেছেন, তার গতিশীলতার মধ্যে মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠার বস্তুগত ও চেতনাগত শর্ত প্রস্তুতির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সমাজতন্ত্র সাম্যবাদ পর্বের মধ্য দিয়ে মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজের ধারণা তাঁর বিশেষণের মধ্য দিয়েই উপস্থিত আছে। তার পরও তাঁর লেখায় সমাজতন্ত্রের নির্দিষ্ট কোনো মডেল আঁকা ছিল না। মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথে এ রকম ছক এঁকে দেয়া সংগতিপূর্ণও

১। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ ও চীনে বিপব-উত্তর পর্বে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও তার পতনের শর্তসমূহ নিয়ে আমার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে 'অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র : সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা' গ্রন্থে।

নয়। তবে মার্কসের দার্শনিক রূপরেখার ওপর ভিত্তি করেই লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবীরা বিপ্লব সংঘটিত করে রাশিয়া ও পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নে নতুন সমাজ গঠনের চেষ্টা করেছেন।

বলাই বাহুল্য, এই চেষ্টায় ঐকমত্য ছিল না। সবকিছু ভেঙেচুরে, তর্কে-বিতর্কে, বুঝ পরিষ্কার করে, শত্রুপক্ষের অব্যাহত আক্রমণের মুখে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে সমাজতন্ত্র দাঁড় করানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সবকিছুই করে করে ঠেকে ঠেকে শেখা। তার ফলে ১৯১৭ থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক দশকে নীতি, প্রতিষ্ঠান, অগ্রাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহু ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

অনেক সময় পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণেও ছিল না। মার্কসের কথায়, 'মানুষই ইতিহাস নির্মাণ করে, কিন্তু তার ইচ্ছামতো করতে পারে না।' সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ ও পরে অবিরাম অন্তর্ঘাত, হিটলারের সর্বাত্মক আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ, পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, সমুদ্র ও মহাকাশ নিয়ন্ত্রণে রাখায় সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে প্রতিযোগিতা, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মোকাবেলা ইত্যাদি করতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অনেক রকম পরিবর্তন আনা হয়েছে, আনার বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে, যে পরিবর্তনের সবগুলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। অব্যাহত সামরিকীকরণ, সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি, গোয়েন্দা সংস্থার সম্প্রসারণ তার অন্যতম। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে যে কোনো মূল্যে উৎপাদন বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এসব উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যয় অনেক বৃদ্ধি করেছে।

> দুর্নীতি, বৈষম্য ও নিপীড়ন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, এগুলো ছাড়া পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু এসব উপাদানের সঙ্গে সামাজিক মালিকানা, সামাজিক কর্তৃত্ব, ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র নামের যে সমাজব্যবস্থা, তার সন্ধি চলে না।

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা : নতুন কেন্দ্রের অভ্যুদয়

মার্কস পুঁজিবাদের গোড়ার দিকে পুঁজিবাদের অন্তর্গত প্রবণতা কিভাবে তাকে বৈশ্বিক ব্যবস্থায় পরিণত করবে তার রূপরেখা হাজির করেছিলেন। ১৯৯০ নাগাদ কয়েকটি দেশ বাদে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর আক্ষরিক অর্থেই পুঁজিবাদ একটি একক বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হয়। এরপর গত কয়েক দশকে পুঁজির গঠন, একচেটিয়াকরণ, অগ্রাধিকার, বহুজাতিক সংস্থার বৈশ্বিক বিস্তার ইত্যাদি ব্যাপকতা লাভ করেছে।

লেনিন ১৯১৬ সালে যে প্রেক্ষাপটে 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থ লিখেছিলেন বর্তমান দুনিয়ায়ও তার ধারাবাহিকতা আছে, তবে প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি, বৈশ্বিক কাঠামো ইত্যাদিতে অনেক নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে ব্রিটেনের পর একক কর্তৃত্বধর হয়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা বিশ্লেষণে তাই আমাদের নতুন দিকগুলোর প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে।[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত ইউরোপের ঔপনিবেশিক দেশগুলোর মধ্যে, লেনিনের ভাষায় বিশ্ব ভাগ-বাটোয়ারা করার যুদ্ধ হলেও তা পুরো বিশ্বব্যবস্থায়ই প্রবল নাড়া দেয়। বৃহত্তম ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্রিটেন ও বিশ্বশক্তির উচ্চাভিলাষী জার্মানী ছিল এই যুদ্ধের প্রধান দুই প্রতিপক্ষ। যুদ্ধের আগেই হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানির গতি-প্রকৃতি ও রণপ্রস্তুতি স্পষ্টতই আশঙ্কাজনক রূপ নিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আগ্রাসী জার্মানিকে ঠেকানোর জন্য ব্রিটেনের সাথে চুক্তিতে আসার চেষ্টা করে। ব্রিটেন রাজি হয়নি। তাদের ধারণা ছিল, জার্মানীর এই উচ্চাভিলাষী অগ্রাভিযানে প্রধানত আক্রান্ত হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাহলে তা তাদের সবার জন্যই লাভজনক হবে। ব্রিটেনের এই অবস্থান দেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সাথেই অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ব্রিটেনসহ ইউরোপীয় দেশগুলোকে কাবু করার পর জার্মানি এই চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৪১ সালে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে এবং দ্রুত মস্কো পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হিটলারের হিসাব ছিল–সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটি পেলেই চলবে, বিপুল সম্পদ করায়ত্ত করে বিশ্বজয়ের আর কোনো বাধা থাকবে না। মহাবিপর্যয় মোকাবেলা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে লালফৌজ নিয়ে পাল্টা আঘাত পরিচালনা করেছিল তা সামরিক, রাজনৈতিক ও গণপ্রতিরোধ–সব দিক থেকেই এক বিশাল ঘটনা। বস্তুত সোভিয়েত লালফৌজের পাল্টা আঘাত ও অগ্রযাত্রা একেবারে বার্লিন পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল। তার অর্থ, সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেই হিটলার তার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিল।

অন্যদিকে জার্মানীর মিত্রশক্তি জাপানের যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবারে আক্রমণের ঘটনার সূত্র ধরে উদীয়মান বিশ্বশক্তি যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের যুদ্ধ তাই এশিয়া ও আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয় প্রধান তিন শক্তি : ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে ব্রিটেন তখন গত, নতুন কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র তার স্থান দখল করেছে। এর পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় দুই ব্যবস্থার দুই প্রতিনিধির মধ্যে : যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত পতনের পূর্ব পর্যন্ত সম্পর্কের নানা ওঠানামা এবং অভ্যন্তরীণ নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও তা অব্যাহত ছিল, রূপ নিয়েছিল দুই পরাশক্তির যুদ্ধের। একে বিশ্বযুদ্ধ বলা না হলেও এই সংঘাত বিশ্বজুড়ে সামরিক-বেসামরিক রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি–সকল ক্ষেত্রেই বিস্তৃত হয়েছিল।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র অনেক দিক থেকেই তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই দেশ ছিল সকল ক্ষয়ক্ষতির বাইরে। বরং এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে, মিলিটারি-ইন্ডস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স বিকশিত হয়েছে, বৃহৎ পুঁজির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই সময়েই বিশ্বে অনেকগুলো উপনিবেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্ব তৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিতি লাভ করে। এসব অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারেও যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে ছিল। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বসংস্থা হিসেবে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলো বিশ্বব্যাপী পুঁজির সম্প্রসারণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এই দুটো সংস্থায়ই যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ছিল নিরঙ্কুশ। নব-উদ্ভূত বিশ্বসংস্থাগুলো এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও আধিপত্য

২। লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সূত্রায়ণের সাথে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার ধারাবাহিকতা কোথায়, কোথায় নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে, তার বিশদ বিশেষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার বিশ্বায়নের বৈপরীত্য গ্রন্থে।

বিস্তারে প্রধান সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একসাথে জার্মান অক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় ভীতসন্ত্রস্ত মার্কিন প্রশাসন প্রথম থেকেই সামরিক-বেসামরিক শিক্ষা সংস্কৃতি–সব ক্ষেত্রেই বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছে। বিভিন্ন থিংক ট্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয়, ফাউন্ডেশন, স্কলারশিপের পাশাপাশি ন্যাটো, সিআইএর সামরিক আয়োজন–সবই পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিশালী ভূমিকার কারণে তাকে উপেক্ষা করে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে প্রবেশ করা যাচ্ছিল না। লালফৌজের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রীদের সাংগঠনিক অবস্থানের কারণে ইউরোপ পুঁজিবাদী বিশ্বের একক কর্তৃত্বে আর ফেরত যায়নি। বেশ কয়েকটি দেশ সোভিয়েত ব্লকে যোগ দেয়। আর বাকি দেশগুলোতেও সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। বিভিন্ন কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে জন-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা সামাল দেয়া হয়।

চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে গত কয়েক দশকে বিশ্বে পারমাণবিক সমরাস্ত্রের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু এর প্রথম ও শেষ প্রয়োগ করেছে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দুটোকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে, এ দুই দিনে মুহূর্তের মধ্যে দেড় লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আরও বহু লক্ষ মানুষকে পঙ্গু করা হয়েছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ংকর আগ্রাসনের খেসারত দিয়ে যাচ্ছে মাত্র এই দুটো শহরেই। এই বোমাবর্ষণের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলা হয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যই এ ধ্বংসলীলা করতে হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার। কারণ আসলে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল মে মাসেই। জাপানও আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠিয়েছে বোমাবর্ষণের আগেই। বস্তুত যুদ্ধশেষে ইউরোপে সোভিয়েত বাহিনীর সবল উপস্থিতি এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একটানা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী শক্তির জনপ্রিয় অভ্যুদয় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের জন্য শুধু অস্বস্তিকরই ছিল না, রীতিমতো ভীতিকরও ছিল। সে কারণে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও, জাপানের আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জানানোর পরও, সেদেশের নিরীহ লক্ষ মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করার শক্তিমত্তা দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আসলে যা করতে চেয়েছে সেটা হলো প্রথমত, পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে নিজের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা; দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নকে সরাসরি হুমকি প্রদর্শন করা; এবং তৃতীয়ত, জাপানের ওপর পূর্ণ দখল নিশ্চিত করা।

১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো মিলে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (ন্যাটো) নামে একটি সামরিক জোট গঠন করে। এর পাল্টা হিসেবেই ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে ওয়ারশতে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সহযাত্রী দেশগুলো, গঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতৃত্বাধীন ওয়ারশ জোট।

যুদ্ধ, আতঙ্ক, নজরদারি : জোয়ারের মোকাবেলায় ম্যাকার্থিজম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে 'মুক্ত বিশ্বকে কমিউনিজমের আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা' করা যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত নীতিতে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার ঘোষণা দেন। সেই ধারাবাহিকতায় বিশ্বজুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তৎপরতা অভূতপূর্ব মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো মিলে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (ন্যাটো) নামে একটি সামরিক জোট গঠন করে। এর পাল্টা হিসেবেই ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে ওয়ারশতে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সহযাত্রী দেশগুলো, গঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতৃত্বাধীন ওয়ারশ জোট। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আলবেনিয়া, পোল্যান্ড, চেকোসোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও পূর্ব জার্মানী। দুই জোটের সংঘাতের নাম দেয়া হয়েছিল 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ', এই শব্দ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জর্জ অরওয়েল, যদিও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জন্য তা ছিল উত্তপ্ত ও রক্তাক্ত।

জাপানে বোমাবর্ষণের পর বৃহৎ আকারে সোভিয়েত প্রভাব বা কমিউনিজমবিরোধী মার্কিন সামরিক প্রথম অভিযান হয় কোরিয়ায়, ১৯৫০ সালে। ১৯৪৫ সালে জাপানের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের পর সোভিয়েত সমর্থন ছিল উত্তরের দিকে, মার্কিনপন্থীরা জমায়েত হয় দক্ষিণে। এর মধ্যেই ১৯৪৯ সালে সংঘটিত হয় চীন বিপ্লব। একই বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করেন, তাঁরা আরও ভয়ংকর হাইড্রোজেন বোমা বা সুপারবম্ব বানাবেন। স্ট্যালিনও পাল্টা ঘোষণা দেন। বাড়তে থাকে উত্তেজনা।

১৯৫০ সালে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণকে মুক্ত করতে তাদের অভিযান শুরু করে। মার্কিন প্রচারণায় বলা হয়, উত্তর কোরিয়াকে না ঠেকালে সারা পৃথিবী গ্রাস করবে কমিউনিজম। সুতরাং 'আন্তর্জাতিক দায়িত্ব' হিসেবেই যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধে নামতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর কোরিয়াকে সমর্থন দেয়, একপর্যায়ে মার্কিন আগ্রাসন থেকে কোরিয়াকে মুক্ত করতে সামরিক বাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেয়। ১৯৫৩ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দুই পরাশক্তির প্রভাববলয়ে নিজ নিজ স্থানেই স্থিত হয়। ঠাণ্ডাযুদ্ধের এটাই প্রথম বহিঃপ্রকাশ; এরপর এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় বহু যুদ্ধের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নই মূল ভূমিকা রেখেছে।

রুশ বিপ্লব, বিপ্লব-উত্তর নির্মাণ, মহামন্দা থেকে মুক্ত অর্থনীতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা নিশ্চিত করা, জাতি-বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণী-লিঙ্গবৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় উলেখযোগ্য অগ্রগতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সফলভাবে মোকাবেলা ইত্যাদি ঘটনা পুঁজিবাদী বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে শুধু শ্রমিক শ্রেণী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ, তরুণ এবং সাংস্কৃতিক জগৎ এমনকি হলিউডেও তার প্রভাব এই মাত্রায় পৌঁছেছিল যে শাসকদের মধ্যে তা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। এর বিরুদ্ধে প্রচারণা ছিল প্রথম থেকেই। যে কোনো অধিকার আন্দোলনকেই 'কমিউনিস্টদের চক্রান্ত', জনপন্থী যে কোনো কর্মসূচিকে সমাজতন্ত্রী কর্মসূচি বলে কোণঠাসা করার চেষ্টা হতো। ত্রিশের দশকে রুজভেল্ট আমলে যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তার বিস্তৃত কর্মসূচি নেয়া হয়। রুজভেল্ট কট্টরপন্থীদের কাছে সমাজতন্ত্রী বলে নিন্দিত হয়েছেন। এই কট্টর ডানপন্থীদের দাপটে, অন্যান্য দেশে সম্ভব হলেও সর্বজনীন চিকিৎসা অধিকার যুক্তরাষ্ট্রে কখনও সম্ভব হয়নি। বীমা কোম্পানি আর ওষুধ কোম্পানির মুনাফা জোগাতে মার্কিন চিকিৎসা এখন সবচাইতে ব্যয়বহুল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কট্টর পুঁজিপন্থীদের মুখপাত্র হিসেবে হাজির হয়েছিলেন সিনেটর ম্যাকার্থি, যিনি যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে কমিউনিজমভীতি ছড়িয়ে নিপীড়ন, হয়রানি ও ত্রাসের এক রাজত্ব তৈরি করেন, যা ম্যাকার্থিজম নামে পরিচিত হয়। সংগঠিত শ্রমিকসংখ্যা এবং কমিউনিস্ট পার্টি অব দ্য ইউএসএর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি–দুটোই ত্রিশের দশক পার হয়ে চল্লিশের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। চল্লিশের দশকের শুরুতে পার্টির সদস্যসংখ্যা ৭৫ হাজার অতিক্রম করেছিল। ম্যাকার্থি যুগে পুলিশি হয়রানি, চাকরিচ্যুতি, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সম্প্রসারণ ইত্যাদি ভয়ংকর রূপ নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, লেখক, শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। আটক, খুন, গুম, চাকরিচ্যুতি–সবই ভয়াবহ আকার নেয়। এটি আবার বহুগুণ হয়ে ফেরত আসে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের' নামে ২০০১-এর পর থেকে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্বে জাতীয় মুক্তির চেষ্টা

পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রান্তস্থ দেশগুলো অভিন্ন অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিতি পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। উপনিবেশ-উত্তর দেশগুলো এই ভিন্ন সত্তার প্রধান শরিক ছিল। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপান বাদে বাকি প্রায় সব দেশই এর অন্তর্ভুক্ত, এর আরেক পরিচয় হতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্ব। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় সবগুলো দেশেই আগে-পরে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও স্বাধীনতা-উত্তর উথাল-পাতাল। যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে তখন সাজাচ্ছে অনেক কিছু। কোথাও কোথাও পুরনো ভারসাম্য নষ্ট করায় স্থিতিহীনতা তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে বেশ কয়েকটি দেশে অভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংঘাত, রাজনৈতিক লড়াই নতুনভাবে গতি নিচ্ছে। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বেশ কিছু দেশ।

সংগঠিত শ্রমিকসংখ্যা এবং কমিউনিস্ট পার্টি অব দ্য ইউএসএর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি–দুটোই ত্রিশের দশক পার হয়ে চল্লিশের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। চল্লিশের দশকের শুরুতে পার্টির সদস্যসংখ্যা ৭৫ হাজার অতিক্রম করেছিল। ম্যাকার্থি যুগে পুলিশি হয়রানি, চাকরিচ্যুতি, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সম্প্রসারণ ইত্যাদি ভয়ংকর রূপ নেয়।

আরব বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, অশান্তির সূচনা হয় ১৯৪৮ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্যোগে প্যালেস্টাইন ভূমিতে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে ১৯৫০-এর দশক থেকে আরব বিশ্বে স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি এবং কোথাও কোথাও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়ে অনেকগুলো পরিবর্তন হয়। মিসর, সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া ও লিবিয়ায় রাজতন্ত্র-ধর্মতন্ত্র উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্রমুখী যাত্রার বিভিন্ন চেষ্টা দেখা যায়। এর মর্মবস্তু ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে অর্থনীতি গড়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল এসব আন্দোলনের জনপ্রিয়তার ভিত্তি।[৩] তেলসহ খনিজ সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানির দখলমুক্ত করে জাতীয়করণ ছিল অন্যতম কর্মসূচি।

প্রায় এক দশক ধরে প্রবল পরাক্রমশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অতিকায় সামরিক শক্তিকে নাকানিচুবানি খাইয়ে সারা বিশ্বে বিপুল অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে হোচিমিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের মানুষ। ১৯৭৫ সালে তাঁদের বিজয় ছিলো বিশ্বজুড়ে উৎসবের বিষয়।

মার্কিন ও সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন দুই ব্লকের বাইরে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেষ্টাও এখানে স্মরণযোগ্য। ১৯৫৩ সালে এর চিন্তা শুরু, ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে এক শীর্ষ সম্মেলনে এর সব বিষয় চূড়ান্ত হবার পর ১৯৫৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয়। এই উদ্যোগের নেতৃত্বে ছিলেন যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ টিটো, মিসরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসের, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, ঘানার নক্রুমা। পরে চীন, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া এর সঙ্গে যোগ দেয়। প্রথম দিকে পঞ্চশীলা নীতি ঘোষিত হয়, পরে বানদুং সম্মেলনে গৃহীত দশটি নীতির ভিত্তিতে এই আন্দোলনে আরও অনেক দেশ যোগ দেয়। এগুলোর মধ্যে ছিল : জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি, সকল দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর প্রতি স্বীকৃতি, ছোটবড় সকল জাতি ও বর্ণের সমানাধিকার, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি, দেশসমূহের বিভিন্ন বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, ন্যায়বিচার, আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা ইত্যাদি। এই আন্দোলন দ্রুত নতুন আবির্ভূত তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠ হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে জাতিসংঘেও জোট নিরপেক্ষ জোট স্বীকৃত হয়।

পাশাপাশি পঞ্চাশের দশক থেকে বিভিন্ন প্রান্তস্থ দেশে নির্বাচিত সরকার উচ্ছেদ, সামরিক শাসন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রমণ, গণহত্যা, দেশে দেশে চক্রান্ত-অন্তর্ঘাত, দখল ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দিনে দিনে নতুন পর্যায়ে পুঁজিবাদী কেন্দ্রের আগ্রাসী রূপ স্পষ্ট করে। দেশে দেশে নিপীড়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ থেকে গণহত্যা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাই প্রধান হয়ে ওঠে। ১৯৫৩ সালে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করে সিআইএ, তেলক্ষেত্র জাতীয়করণ ছিল তাঁর প্রধান অপরাধ। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ইন্দোনেশিয়ায় সিআইএর প্রত্যক্ষ ভূমিকায় সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, যাতে দশ লক্ষাধিক মানুষ নিহত ও নিখোঁজ হন, ক্ষমতাচ্যুত হন সুকর্ণ। ল্যাটিন আমেরিকায় একে একে সামরিক শাসন জারি এবং তাকে স্থায়িত্ব দিয়ে মার্কিন প্রশাসন এই অঞ্চলে তার পথ প্রশস্ত করে।[৪] চিলিতে ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত সরকার উচ্ছেদ করে বসানো হয় কুখ্যাত জেনারেল পিনোচেটকে। উইলয়াম ব্লুমের গবেষণা অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৭০টিরও বেশি সামরিক আগ্রাসনে যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত ছিল। বিশ্বের সবচাইতে নিকৃষ্ট সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি শনাক্ত করেছেন। পঞ্চাশ থেকে পরবর্তী কয়েক দশকে বিভিন্ন দেশের সামরিক জেনারেলরাই ছিল মার্কিন আধিপত্য তৈরির প্রধান অবলম্বন। এসবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বই ছিল সব দেশের মানুষের ভরসার জায়গা। কিন্তু সেই ভরসায় ক্রমে ফাটল দেখা দেয়।

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সমতা, সহযোগিতা, সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে

৩। প্রান্তস্থ দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের চেষ্টা, সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আমার লেখা আগ্রহী পাঠক দেখতে পারেন প্রান্তস্থ দেশে সমাজতন্ত্র, পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।
৪। এই পর্বের চিত্র পাওয়া যাবে জন পিলজারের তথ্যচিত্র 'ওয়ার অন ডেমোক্রেসি'তে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নে ল্যাটিন আমেরিকা এবং সোভিয়েত পতনের আগে ও পরে কিউবার লড়াই সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পাঠকরা আরও দেখুন আমার বিপবের স্বপ্নভূমি কিউবা

'নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু তেলসংকট, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পরিবর্তন এবং মস্কো-পিকিংয়ের বিবাদ সব মিলিয়ে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আর দাঁড়াতে পারেনি। বরং বিশ্বপরিসরে এই সময় থেকে বিশ্বব্যাংক- আইএমএফের কর্তৃত্ব বাড়ে, বিভিন্ন দেশে পুঁজিমুখী সংস্কার শক্তিশালী হয়, বহুজাতিক পুঁজির আন্তর্জাতিক বিস্তার দ্রুততর হয়। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনও ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রভাব, ভাঙন এবং উল্টো যাত্রা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি জনপন্থী সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিতে হাত দিতে হয়। অন্যদিকে পুঁজিবাদী কেন্দ্র ও প্রান্তের দেশগুলোর শাসকরা উত্তরোত্তর সোভিয়েত প্রভাব এবং সমাজতন্ত্রী শক্তিসমূহের বিকাশের মুখে একই সাথে দুটো 'সমাজতন্ত্রবিরোধী' কাজে মনোযোগ দেয়; এর একটি হলো বামপন্থী বিপ্লবী শক্তি দমন, আর অন্যটি হলো পাল্টা কল্যাণমূলক কিছু কর্মসূচি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রমুখী দেশে নীতিগত অবস্থানের সাথে সংগতিপূর্ণ যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল : সকল নাগরিকের পূর্ণ কর্মসংস্থান, কাজ ও জীবনের নিরাপত্তা, সর্বজনীন চিকিৎসা সুবিধা, সকলের জন্য নিশ্চিত আবাসন, উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষার সকল পর্যায়ে নাগরিকদের প্রবেশাধিকারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ, বছরে সবেতন বিনোদন ছুটি, দীর্ঘ সবেতন মাতৃকালীন ছুটি, রাষ্ট্রীয় খরচে শিশু যত্ন কেন্দ্র। এসব কর্মসূচির সাফল্যের কারণে পশ্চিমের দেশগুলোতেও এসব কর্মসূচির পক্ষে প্রবল জনমত তৈরি হয়। বিশেষত ত্রিশের মহামন্দায় যখন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিপর্যস্ত, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে নিশ্চিত নিরাপদ স্বচ্ছন্দ জীবনের খবর পশ্চিমের মানুষদের কাছ থেকে আড়াল করা সব সময় সম্ভব হয়নি। তাই ত্রিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত পশ্চিমা বিভিন্ন দেশে আমরা কল্যাণমূলক বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেখি। সহজ শর্তে ঋণব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাজারভিত্তিক সমাধান বা ব্যক্তি ভোগ সম্প্রসারণেরও বিভিন্ন কর্মসূচি এসময় পশ্চিমা দেশগুলোতে বিকশিত হয়।

> ১৯৫০-এর দশক থেকে আরববিশ্বে স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি এবং কোথাও কোথাও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়ে অনেকগুলো পরিবর্তন হয়। মিসর, সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া ও লিবিয়ায় রাজতন্ত্র-ধর্মতন্ত্র উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্রমুখী যাত্রার বিভিন্ন চেষ্টা দেখা যায়। এর মর্মবস্তু ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা।

ষাটের দশকে পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের পাশাপাশি শ্রমিক, নারী, শিক্ষার্থী অধিকারের আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ফ্রান্স ও ইটালিতে শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের আন্দোলন পুঁজিবাদবিরোধী ব্যাপক অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, যুদ্ধ এবং দেশের ভেতরের সম্পদের কেন্দ্রীভবনবিরোধী বিক্ষোভ বহু দেশে বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ভূমিকার বিরুদ্ধে, যথেষ্ট ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্য সুলভ না হবার কারণে।

১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু-পরবর্তী বিভিন্ন অস্থিরতা পার হয়ে ক্রুশ্চেভের ক্ষমতা গ্রহণ, ১৯৫৬ সালে তাঁর বক্তৃতা এবং রাজনৈতিক অবস্থান পুরো সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বকে গ্রাস করে। অন্যদিকে স্ট্যালিন বিরোধিতা ও পশ্চিমের দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি পুঁজিবাদী বিশ্বকে আশাবাদী করে তোলে। স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রচারণায় ব্যবহার করা তাদের জন্য সুবিধাজনক হয়।

১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে চীন প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করে রাজনৈতিক মতাদর্শিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিতর্ক ক্রমে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্লকে একে একে ভাঙনের সৃষ্টি করে। দশকের শেষ নাগাদ বিশ্বের দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। বিপ্লবী সংগ্রাম তো বটেই, বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামও এতে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন থেকে সব রকম কারিগরি আর্থিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়। চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' নামে অভিহিত করতে থাকে। পূর্ব ইউরোপের মধ্যে আলবেনিয়াও মস্কোবিরোধী অবস্থান নেয়।

সাংস্কৃতিক বিপবের পর চীন সত্তরের দশকের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে, দশকের শেষ থেকে দেং জিয়াও পিংয়ের নেতৃত্বে বাজারমুখী সংস্কারে অগ্রসর হয়। তবে এর ধরন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পরিকল্পিত। এই সংস্কারের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনে ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ এবং বহুজাতিক পুঁজির উলেখযোগ্য প্রবাহ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। চীনের নেতৃবৃন্দ এই ব্যবস্থার নামকরণ করেন 'বাজার সমাজতন্ত্র'।

১৯৭২ সালে সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দাঁতাত বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে। সল্ট-১ বা স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিমিটেশন ট্রিটি স্বাক্ষরিত হয় এ বছরই। সত্তরের দশকেই সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়ে আসে, উপরন্তু ঠাণ্ডাযুদ্ধের চাপে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়তে থাকে, গোয়েন্দা সংস্থা ও সামরিক বাহিনী বিষয়ে ব্যয় বরাদ্দ অগ্রাধিকার পেতে থাকে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উদ্ভাবন আমলাতন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পার্টি আমলাতন্ত্র আরও ভারী হয়ে বসে জনগণের ওপর। পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব, বিভিন্ন নীতি প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ শূন্য হয়ে যাওয়া, দুর্নীতি, জনবিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কারণে পার্টি নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্রের ভেতর ব্যক্তি পুঁজির পুঞ্জীভবন ঘটতে থাকে। একটি নব্য ধনিক শ্রেণী পার্টি ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় ক্রমশ সংগঠিত হয়। পার্টি নেতৃত্ব পরিণত হয় একনায়কসুলভ শাসনব্যবস্থার ধারক-বাহকে।

আশির দশকে মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতাসীন হবার পর এরাই পরিবর্তনের আওয়াজ তোলে। জনগণের মধ্যেও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল, কিন্তু তা ছিল তাদের সংকুচিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য, হারানোর জন্য নয়। গাসনস্ত (রাজনৈতিক সংস্কার) ও পেরেস্ত্রোইকা (অর্থনৈতিক পুনর্গঠন) নামে যে পরিবর্তনের কথাবার্তা শুরু হলো তা নতুন আশাবাদের সঞ্চার করেছিল

দেশে ও বিশ্বব্যাপী। কিন্তু ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত নব্য শ্রেণী এবং তাদের আন্তর্জাতিক মিত্ররা অন্য লক্ষ্যে আরও অনেক দূর যাবার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। তবে তারাও সোভিয়েত ইউনিয়নের পুরো ব্যবস্থার এত দ্রুত পতন প্রত্যাশা করেছে এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার কাছে গর্বাচেভের আত্মসমর্পণ, ওয়ারশ চুক্তির সদস্যদের ন্যাটোর কাছে সমর্পণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের পতন ত্বরান্বিত করে।

আশির দশকে রোনাল্ড রিগ্যান-থ্যাচারের শাসনকালে পুঁজিমুখী তৎপরতা আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠে। একদিকে যুদ্ধ অর্থনীতির বিস্তার ঘটে, অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের নেতৃত্বে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিশ্বজুড়ে নয়া-উদারতাবাদী সংস্কার জোরদারভাবে চলতে থাকে। দশকশেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কথিত 'সমাজতান্ত্রিক' ব্যবস্থার পতনে বিশ্ব পুঁজি নতুন প্রাণ লাভ করে, একচেটিয়া ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তৃত হয়, পশ্চিমা দেশগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীকৃত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপরও আক্রমণের আয়োজন শুরু হয়।

অব্যাহত সামরিকীকরণ : ধ্বংস খাতের বিকাশ

আর্নেস্ট ম্যান্ডেল পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা বিশেষণ করে বলেছিলেন, পুঁজিবাদের এই পর্যায়ে মার্কসের সূত্র অনুযায়ী অর্থনীতি শুধু পুঁজিপণ্য আর ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের দুটো বিভাগ দিয়েই পরিচালিত হয় না। এখন এখানে যোগ হয়েছে আরেকটি বিভাগ–ধ্বংস বিভাগ। তিনি সমরাস্ত্র খাতের অভূতপূর্ব বিকাশ এবং সকল উৎপাদনী খাতের ওপর তার কর্তৃত্ব বিস্তারকে পুঁজিবাদের জন্য অনিবার্য দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পুঁজিবাদে যুদ্ধ সমরাস্ত্র কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, কারণ এই ব্যবস্থা স্থায়ী যুদ্ধ অর্থনীতি দ্বারাই পরিচালিত। (ম্যান্ডেল, ১৯৭৬)

> সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রমুখী দেশে নীতিগত অবস্থানের সাথে সংগতিপূর্ণ যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল : সকল নাগরিকের পূর্ণ কর্মসংস্থান, কাজ ও জীবনের নিরাপত্তা, সর্বজনীন চিকিৎসা সুবিধা, সকলের জন্য নিশ্চিত আবাসন, উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষার সকল পর্যায়ে নাগরিকদের প্রবেশাধিকারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ, বছরে সবেতন বিনোদন ছুটি, দীর্ঘ সবেতন মাতৃকালীন ছুটি, রাষ্ট্রীয় খরচে শিশু যত্ন কেন্দ্র। এসব কর্মসূচির সাফল্যের কারণে পশ্চিমের দেশগুলোতেও এসব কর্মসূচির পক্ষে প্রবল জনমত তৈরি হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অনেক পণ্ডিত ঘোষণা দিয়েছিলেন, এবারে বিশ্বে সব যুদ্ধের অবসান হবে, যুদ্ধ উত্তেজনা, ঠাণ্ডাযুদ্ধের কারণ শেষ। এবারে বিজয় হবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের। কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া পুঁজিবাদ বাঁচবে কী করে? হিংসা, উন্মাদনা, লোভ, ভোগ আর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ওপর ভর করে যার বিকাশ তা যদি একচেটিয়া ক্ষমতা পায় তাহলে গণতন্ত্র আর সম্প্রীতি কী করে শক্তিশালী হবে? ঠিক তা-ই ঘটল। কয়েক মাস পরই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের নতুন ফ্রন্ট খুলল–মধ্যপ্রাচ্য। যুক্তরাষ্ট্র অজুহাত পেয়ে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করল মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী সেক্যুলার রাষ্ট্র ইরাকের ওপর। এরপর বিশ্ব পুঁজিবাদের জীবনঘড়ি পথ পেয়ে গেল। তার ধারাবাহিকতায় বিশ্বজুড়ে আবারও উত্তেজনা। যুক্তরাষ্ট্রসহ পুঁজিবাদী বিশ্বে সাজ সাজ রব, যুদ্ধ অর্থনীতি আবারও চাঙ্গা হলো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, শত্রু কোথায়? গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বানানো গল্প তৈরি হলো। এবারে শত্রু আরও ভয়াবহরূপে উপস্থিত করা হলো–ইরাক, যে তৈরি করছে 'মানববিধ্বংসী অস্ত্র'। ১৯৯১ সালে এই দেশের ওপর সর্বব্যাপী হামলার পর শুরু হলো অবরোধ। যুদ্ধবাজদের সাজানো পুতুল হিসেবে উত্তেজনায় শরিক হলো জাতিসংঘ।

আফগানিস্তান যুদ্ধে সোভিয়েতপন্থী সরকার উচ্ছেদে গোপন যুদ্ধ ও গোয়েন্দা তৎপরতায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়। সে সময় প্রত্যক্ষ তদারকিতে মার্কিন প্রশাসন ইসলামপন্থী বহু সশস্ত্র গোষ্ঠী তৈরি করে। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি করা মুজাহিদীন আর তালেবান হলো কখনো নিজের অস্ত্র, কখনো মোক্ষম উপলক্ষ। একই সময়ে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান সেন্ট্রাল আমেরিকা ও আফ্রিকার নানা দেশে যুদ্ধ লাগিয়ে রাখলেন, ক্ষুদ্র দ্বীপ গ্রানাডায় মার্কিন সেনাবাহিনী দখল করে বসে থাকল। পিতা বুশ প্রথমে গ্রানাডা ও পরে ইরাক দখল অভিযান চালালেন। ক্লিনটন প্রশাসন এগুলোর ধারাবাহিকতায় ইরাক অবরোধসহ নানাভাবে সক্রিয় রাখল। সোমালিয়া ও পারস্য উপসাগরে সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো হলো এই সময়েই। পুত্র বুশ অনন্ত যুদ্ধের সূচনা করলেন।

২০০১ সালে টুইন টাওয়ার হামলার পর পুরোদমে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' নামে অনন্ত যুদ্ধ শুরু হলো। সারা বিশ্ব এখন দেখছে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসের এমন আয়োজন, যা বিশ্ব এর আগে কখনো দেখেনি। এর বিশ্বনেতা বিশ্বের সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। এই মডেলে 'মুসলিম সন্ত্রাসী' প্রধান শত্রু, ভয়ংকর। এই মডেল প্রায় সব দেশের শাসকদের জন্য নিপীড়নমূলক আইন সন্ত্রাসী ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য খুবই সুবিধাজনক অছিলা হয়েছে। এই কাজে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র ইসরাইলের পাশাপাশি সৌদি আরব ও কতিপয় মুসলিমপ্রধান দেশ।

বর্তমান বিশ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেউ কেউ 'পশ্চিম বনাম ইসলাম' দ্বন্দ্ব হিসেবে আখ্যায়িত করতে চান। কিন্তু তাতে এর ভেতরের অনেক স্রোত বোঝা সম্ভব হয় না, বোঝা সম্ভব হয় না এর মূল গতিমুখ। বরং আমরা যদি বিশ্ব পুঁজিবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির গতির বর্তমান পর্ব হিসেবে এটিকে পাঠ করি তাহলে তা পুরো চিত্র ধারণ করতে সক্ষম হবে। বোঝা যাবে পুঁজির নিজের টিকে থাকার, সম্প্রসারিত হবার, আরও আরও ক্ষেত্র পুঁজির কর্তৃত্বে আনার এবং নিজ বর্বর চেহারা আড়াল করার উপযুক্ত বাহানা বর্তমান কালের 'ধর্মযুদ্ধ'। তাতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী বোধ সবই খুবই কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। সমাজের ভেতর সব রকম প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা ও তৎপরতা পুষ্টি পাচ্ছে এখান থেকেই। পশ্চিম যেমন কোনো সমরূপ পক্ষ নয়, ইসলামও তা-ই। পশ্চিমে যেমন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি আছে, মুসলমান শাসকদের মধ্যেও তেমনি সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের অংশীদার আছে।

আল-কায়েদা, তালেবানদের পর তৈরি হয়েছে আইসিস, দেশে দেশে অসংখ্য নামের নতুন নতুন গোষ্ঠী, যার অছিলায় বিশ্বজুড়ে সামরিকীকরণ, গোয়েন্দা সংস্থার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি, মত প্রকাশসহ গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, খুন-গুম–সবই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার হামলার ওপর ভর করে ২০০১ সালের পরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতে ব্যয় ক্রমাগত বাড়ানো হয়েছে। ২০০০

সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৫৯ বিলিয়ন ডলার, ২০০৪ সালে পৌঁছে ৫৪৪ বিলিয়ন এবং বর্তমানে তা প্রকৃতপক্ষে এক ট্রিলিয়ন ডলারে। বাড়ানো হয়েছে দেশে-বিদেশে প্রাইভেট সেনা ও পুলিশ ঠিকাদারদের বরাদ্দ, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ক্ষমতা ও বরাদ্দ। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা, মেডিকেয়ারসহ গরিবদের নানা কর্মসূচি সংকুচিত হয়েছে। জেমস পেট্রাসের ভাষায়, কল্যাণমুখী কর্মসূচির সংকোচন ও পুলিশি রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তারে জন্ম হয়েছে 'financial-security power elite'।[৫]

জাতি ধর্ম বর্ণ বিদ্বেষী সন্ত্রাসের বিশ্ব

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে উদারনৈতিক গণতন্ত্র নিয়ে বিশ্ব স্থিত হবে–এই ধারণাই প্রচার করা হয়েছিল। (ফুকুয়ামা, ১৯৯১) কিন্তু স্থিত হবার বদলে বিশ্ব এখন আরও অস্থির। 'উদারনৈতিক গণতন্ত্র'ও এখন হুমকির মুখে। অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ পরে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের ২৭ বছর পরের বর্তমান বিশ্ব জাতিগত, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক সংঘাত, ঘৃণা ও বিদ্বেষে জর্জরিত। জগৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না দেখলেও এসব ঘিরে যুদ্ধ, সন্ত্রাস আর চরমপন্থার বিস্তার দেখছে। অসহিষ্ণুতা, সহিংসতায় প্রতিদিন মরছে মানুষ। গত ২৫ আগস্ট থেকে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জাতির ওপর ভয়াবহ জাতিগত নিধনযজ্ঞ শুরু করেছে সেনা সমর্থিত সরকার, ৭ লক্ষাধিক মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয়ের জন্য ছুটে এসেছে। সেই সরকারকে এখন সমর্থন দিচ্ছে সোভিয়েত-উত্তর রাশিয়া, বিশ্ব পুঁজিবাদের ভরসা চীন আর তাদের সাথে আছে ভারত।[৬]

AMERICANS.....

DON'T PATRONIZE REDS!!!!

YOU CAN DRIVE THE REDS OUT OF TELEVISION, RADIO AND HOLLYWOOD.....

THIS TRACT WILL TELL YOU HOW.

WHY WE MUST DRIVE THEM OUT:

1) The REDS have made our Screen, Radio and TV Moscow's most effective Fifth Column in America . . . 2) The REDS of Hollywood and Broadway have always been the chief financial support of Communist propaganda in America . . . 3) OUR OWN FILMS, made by RED Producers, Directors, Writers and STARS, are being used by Moscow in ASIA, Africa, the Balkans and throughout Europe to create hatred of America . . . 4) RIGHT NOW films are being made to craftily glorify MARXISM, UNESCO and ONE-WORLDISM . . . **and via your TV Set** they are being piped into your Living Room—**and are poisoning the minds of your children under your very eyes!!!**

So REMEMBER — If you patronize a Film made by RED Producers, Writers, Stars and STUDIOS you are aiding and abetting COMMUNISM . . . every time you permit REDS to come into your Living Room VIA YOUR TV SET you are helping MOSCOW and the INTERNATIONALISTS to destroy America!!!

ছবি: ম্যাকার্থিজম কালে কমিউনিস্ট বিরোধী ব্যাপক প্রচারণার একটি নমুনা

অক্টোবর বিপ্লব মানুষকে বৃহৎ স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়েছিল। পৃথিবীর সকল প্রান্তে সব রকম বৈষম্য ও নিপীড়নবিরোধী লড়াইয়ে এই বিপব দিয়েছিল পথের দিশা। পৃথিবীর মানুষ বৈষম্য ও নিপীড়নের বহু জিঞ্জির ভেঙেছে। বহু রকম শোষণ-নিপীড়নের পাশাপাশি জাতিগত নিপীড়ন ও দাসত্ব থেকে মুক্তির লড়াইয়ের শক্তি জুগিয়েছে। কিন্তু ভেতর ও বাইরের বিভিন্ন কারণে এর দুর্বলতা প্রাপ্তিই বর্তমান দুনিয়াকে ভয়ংকর পরিস্থিতির দিকে টেনে নিচ্ছে। হঠাৎ করেই যেন মানুষ অনেক ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। হয়ে গেছে নিরাশ্রয়। তাই বৃহৎ কোনো স্বপ্ন দেখার বদলে সে এখন নিজেকেই খোঁজে, মানুষে মানুষে সংহতির সম্ভাবনা দেখা ভুলে গিয়ে জাতি ধর্ম বা অঞ্চলের পরিচয়ে নিজেকে সাজায় আর বাকি সবার বিরুদ্ধে। এখন যেন সবাই সবার শত্রু!

প্যালেস্টাইন আর কাশ্মীর সমস্যা সংঘাত গণহত্যার কথা আমরা শুনছি ছোটবেলা থেকেই। তার সমাধানের নানা লেফট-রাইটের পর যথারীতি সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। এখন 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' মডেলে এদের ওপর হামলা জোরদার করার অজুহাত আরও বেড়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে আরও বহু নতুন অঞ্চল। একে একে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইউরোপে শরণার্থী প্রবাহ এসবেরই পরিণতি। অন্যদিকে ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে এখন খ্রিস্টান ও শ্বেতাঙ্গ চরমপন্থীদের জোরদার বিস্তার দেখা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স সর্বশেষ জার্মানীর নির্বাচনে এর প্রতিফলন খুব স্পষ্টভাবেই ঘটেছে।

২০১১ সালের ২২ জুলাই নরওয়ের অসলোর ওতোয়া দ্বীপে লেবার পার্টির আয়োজনে শিক্ষার্থীদের একটি ইয়ুথ ক্যাম্প হচ্ছিল, যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল কিশোর-কিশোরী। এই ক্যাম্পে নির্বিচার গুলিবর্ষণে নিহত হয় ৭৭ জন। খুনি শ্বেতাঙ্গ তরুণ একটি চরমপন্থী বর্ণবাদী গ্রুপের সদস্য। বিচারকালে বলেছিল, সে বিশ্বাসঘাতকদের খুন করেছে, যারা নরওয়েকে ইসলামিক উপনিবেশ বানানোর পথে সহযোগিতা করছে।

গত এক দশকে জার্মানিতে নব্য নাৎসিদের সন্ত্রাসী তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিকভাবেও তারা এখন অনেক সংগঠিত। গত

৫। The Great Transformation: From the Welfare State to the Imperial Police State, 07.13.2012, http://petras.lahaine.org/?p=1903

৬। ২০০৮ সালে মহামন্দার সময় ইকোনমিস্ট পত্রিকা লিখেছিল : 'Once we told only capitalism can save China, now we must admit that only China can save capitalism.'

২৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ নির্বাচনে চরম ডানপন্থী দল এখানে শতকরা ১৩ ভাগ ভোট পেয়ে প্রায় ৭০টি আসন পেয়েছে, এর আগে যাদের একটিও আসন ছিল না। ১৯৯৯ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে নব্য নাৎসি সন্ত্রাসী গ্রুপ ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট আন্ডারগ্রাউন্ড ১৪টি সশস্ত্র ডাকাতি করেছে এবং ১১টি খুন করেছে।[৭] সমাজে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী সন্ত্রাসীদের শক্তিবৃদ্ধির একটি বড় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গ্রিসে ২০১৩ সালে। গ্রিস, স্পেন, পর্তুগাল সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। এত বছর পরে গ্রিসে সামরিক শাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়েছিল 'গোল্ডেন ডন' নামে একটি সংগঠনের নেতৃত্বে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনে এদের প্রভাব টের পাওয়া যায় সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর। ইসলামের বিরোধী হিসেবেই অনেকগুলো চরমপন্থী দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে। অভিবাসী, সমকামী, সমাজতন্ত্রী, গর্ভপাত ইত্যাদি

ছবি: জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। বাঁ থেকে
জওয়াহেরলাল নেহরু, নক্রুমা, গামাল আবদুল নাসের, সুকর্ণ, জোসেফ টিটো।

বিরোধী গ্রুপ হিসেবেও তাদের তৎপরতা দেখা যায়। (রেজিস্টার, ২০১৫)

একজন বিশেষজ্ঞ পশ্চিমা দেশগুলোতে তিন ধরনের জাতি বর্ণ বিদ্বেষী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব শনাক্ত করেছেন। এগুলো হলো : (১) প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিস্ট বা নব্য নাৎসি ভাবধারায় গঠিত; এর মধ্যে আছে গ্রিসের গোল্ডেন ডন, হাঙ্গেরির জব্বিক, ইউক্রেনের রাইট সেক্টর, জার্মানির ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, ফ্রান্সের ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন পার্টিসহ নানা ছোট ছোট গ্রুপ। (২) আধা ফ্যাসিবাদী পার্টি, প্রত্যক্ষভাবে না বললেও ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি দ্বারা পরিচালিত; যেমন– ফ্রান্সের এফএন, অস্ট্রিয়ান ফ্রিডম পার্টি, বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ ইন্টারেস্ট পার্টি ইত্যাদি। এবং (৩) চরম ডানপন্থী পার্টিগুলো, যেগুলো বর্ণবাদী, অন্য ধর্ম বিদ্বেষী, অভিবাসীবিরোধী কর্মসূচি দ্বারা পরিচালিত; যেমন–ইটালিয়ান নর্দার্ন লীগ, সুইস ইউডিসি, যুক্তরাজ্যের ইনডিপেনডেন্স পার্টি, ডাচ পার্টি ফর ফ্রিডম, নরওয়ের প্রগ্রেস পার্টি, ফিনস পার্টি, ডেনিশ পিপলস পার্টি ইত্যাদি।[৮]

'নয়া উদারনৈতিক' নামে পরিচিত কট্টর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণে স্থিতিশীল কাজের ক্ষেত্র ও নিরাপত্তা সংকোচন, দমন-পীড়নমূলক আইন, যুদ্ধমুখী তৎপরতায় দখলকৃত দেশ ধর্ম বর্ণ বিরোধী হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচারণা, সাম্য-অসাম্প্রদায়িকতা-সর্বজনীন মৌলিক অধিকার বিরোধী মতাদর্শিক প্রভাব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চরমপন্থী সাম্প্রদায়িক জাতি বর্ণ বিদ্বেষী গোষ্ঠীগুলোর বিস্তার ঘটছে।

'বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ' বলে অভিহিত ভারতের অভিজ্ঞতাও এখানে উল্লেখযোগ্য। ভারতে পুঁজিবাদ বিকাশে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেহরু মডেল দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির পক্ষেই কাজ করেছে। (আমিন, ১৯৯২) জাতিগত বিদ্বেষ, ভারতীয় সমাজের জাত বা বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত–এগুলো বরাবরই ছিল। 'উদারনৈতিক রাজনীতি' সমাজের এসব সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেনি। পুঁজিবাদের বিকাশ যাত্রায় বরং এগুলো কোথাও কোথাও আরও তীব্র হয়েছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে উদারনৈতিক বলে পরিচিত কংগ্রেসের অধীনেই নব্য উদারনৈতিক বা কট্টর পুঁজিপন্থী সংস্কার শুরু হয়। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে ওঠা বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দেয়া হয় অর্থনীতি। এসব কোম্পানির দাবি বাড়তে থাকে, তাদের পক্ষে রাষ্ট্রের ভূমিকা আরও নগ্ন করে তোলায় তাদের সবচাইতে বেশি আস্থা দেয় হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি। পাশাপাশি সমাজের ভেতরে বাড়তে থাকা সাম্প্রদায়িক বর্ণবাদী সংস্কৃতি বিস্তৃত হতে থাকে। এরই ফলাফল বিপুল পুঁজিসমর্থন ও জনসমর্থন নিয়ে বিজেপির ক্ষমতায় আরোহণ। শক্তিশালী গতিশীল নেতা হিসেবে নন্দিত হন গুজরাট গণহত্যায় প্রধান ভূমিকা পালনকারী হিসেবে অভিযুক্ত নরেন্দ্র মোদি। বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সমর্থন আর তিলে তিলে গড়ে তোলা সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার ওপর ভর করে তাঁর বিজয় নিশান উড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের মনোনয়নই ছিল অনেকের কাছে বড় বিস্ময়। তাঁর নির্বাচিত হওয়া ছিল আরও বেশি বিস্ময়ের। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মানুষ তো বটেই, বহু রিপাবলিকানও এতটা হজম করতে পারছে না, যদিও ট্রাম্প তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থানকেই খুব স্থূলভাবে প্রকাশ করছেন। ট্রাম্পের এই উত্থান কী নির্দেশ করে? এ রকম স্পষ্ট 'অপর'বিদ্বেষী, অ-শ্বেতাঙ্গ, অ-খ্রিস্টান, অ-পুরুষ, অ-ব্যবসার প্রতি খড়্গহস্ত কেউ যখন অনেক ধাপ পার হয়ে সরকারপ্রধানের পদ পর্যন্ত পৌঁছে তখন তা থেকে সমাজের কী চিত্র পাই আমরা? বোঝা যায়, সমাজে এই রাজনীতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। নির্বাচনের পর বিভিন্ন জরিপ ও বিশেষণে দেখা গেছে, শ্বেতাঙ্গ পুরুষরাই ট্রাম্পের প্রধান সমর্থক, যাদের মধ্যে অনেক শ্রমিকও আছে। ট্রাম্পের মূল সোগান ছিল–'আমেরিকা ফার্স্ট'। মর্মবস্তু যুক্তরাষ্ট্রের কারখানা বিনিয়োগ আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত আনতে হবে।

গত দুই দশকে বিশ্বায়ন নামে পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ হয়েছে দ্রুত। যেখানে কর কম বা কর ফাঁকি দেয়া যায়, যেখানে মজুরি কম, যেখানে মুনাফা সর্বোচ্চ করার সুবিধা বেশি, যেখানে দুর্নীতিবাজ সরকার ও আমলাদের দিয়ে যা খুশি করা যায়, পুঁজি চলে গেছে সেখানেই। পুঁজির বিনিয়োগ সুবিধা একচেটিয়া করতে বহু দেশে অর্থনৈতিক সংস্কার করতে কোথাও দেনদরবার, কোথাও বল প্রয়োগের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানির পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের সকল হাত, বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এডিবি, সিআইএ, থিংক ট্যাংক, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, প্রচার-প্রচারণা–সবই কাজে লাগানো হয়েছে। সেই ধারায় যুক্তরাষ্ট্রসহ পুঁজিবাদী কেন্দ্র দেশগুলোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা ও বাণিজ্যিক তৎপরতা এসব দেশে নিয়ে

৭। Liz Fekete: 'Neoliberalism and Popular Racism: The Shifting Shape of the European Right, Socialist Register 2016.
৮। Michael Lowy and Francis Sitel: 'The Far Right in France: The Front National in European Perspective', Socialist Register 2016.

গেছে। যেভাবে এই কাজগুলো হয়েছে, তাতে এসব দেশের উন্নয়ন হয়েছে বৈপরীত্য আর অসংগতিতে ভরা। অন্যদিকে এই একই কারণে কেন্দ্র দেশগুলোতে কাজের সুযোগ কমে গেছে। বেকারত্ব বেড়েছে, কাজের ধরনগুলো হয়েছে অনিশ্চিত। বেড়েছে খণ্ডকালীন চুক্তিভিত্তিক ভাসমান কাজ।

বিশ্বজুড়ে কাজ ও মজুরির নিরাপত্তা নিয়ে লড়াইয়ের শক্তি ও সংগঠনও এখন দুর্বল হয়ে গেছে। আশির দশক থেকে পশ্চিমা বিশ্বে ট্রেড ইউনিয়নগুলোও ক্ষয়ের শিকার হয়। ১৯৫০ সালে যেখানে মোট কর্মশক্তির শতকরা ৩০ ভাগ ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত ছিল, সেখানে ২০১২ সালে তা শতকরা ১১ ভাগে নেমে এসেছে। বেসরকারি খাতের শতকরা ৯১ ভাগের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ভাঙন, সামাজিক অধিকারের আন্দোলনে দুর্বলতার ফলে সৃষ্ট পুঁজির একচেটিয়া ক্ষমতার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলা সম্ভব হয়। অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, খণ্ডকালীন কাজই হয়ে দাঁড়ায় মূলধারা।

কেন্দ্র দেশগুলোতে তুলনামূলক কম মজুরির কাজে অভিবাসীদের অংশগ্রহণ বেশি। কর্মসংস্থানের সংকটে জর্জরিত পুরনো নাগরিকদের কাছে এই অভিবাসীদের ভয়ংকর প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা খুবই সহজ। চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির জন্য এই পরিস্থিতি খুবই সুবিধাজনক হয়েছে। কর্মসংস্থানের সংকট থাকলেই যে মানুষ সব সাম্প্রদায়িক আর অভিবাসী বিদ্বেষী হয়ে যাবে, তা তো নয়। কিন্তু যদি আতঙ্ক ছড়ানো যায়, যদি মিডিয়া, চলচ্চিত্র দখল করা যায়, যদি সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে অভিবাসীর আগমনকে যুক্ত করা যায়, তাহলে সমাজে তার প্রভাব পড়বেই।

> 'নয়া উদারনৈতিক' নামে পরিচিত কট্টর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণে স্থিতিশীল কাজের ক্ষেত্র ও নিরাপত্তা সংকোচন, দমন-পীড়নমূলক আইন, যুদ্ধমুখী তৎপরতায় দখলকৃত দেশ ধর্ম বর্ণ বিরোধী হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচারণা, সাম্য-অসাম্প্রদায়িকতা-সর্বজনীন মৌলিক অধিকার বিরোধী মতাদর্শিক প্রভাব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চরমপন্থী সাম্প্রদায়িক জাতি বর্ণ বিদ্বেষী গোষ্ঠীগুলোর বিস্তার ঘটছে।

এককেন্দ্রিক ভারসাম্যহীন পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা তার টিকে থাকার জন্যই অধিক থেকে অধিকতর হারে ধ্বংসাত্মক, সামরিকীকৃত, শৃঙ্খলিত ও ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠছে; ভয়াবহ হারে বাড়ছে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক ও বিচ্ছিন্নতা। উন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধির নামে প্রকৃতি ও মানুষ বিধ্বংসী ক্রমবর্ধমান তৎপরতা পুরো ব্যবস্থাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মানুষের অস্তিত্বের বিপরীতে। (মুহাম্মদ, ২০১০)

তবে এর উল্টোদিকও আছে। পরাজয়ের অনেক স্বাক্ষরের পাশাপাশি গত কয়েক দশকে দুনিয়া জুড়ে মানুষের পক্ষে অনেক নতুন উপাদান যোগ হয়েছে, বাঁকবদল ঘটছে। স্বৈরতন্ত্র, সহিংসতা, রক্ষণশীলতার পাশাপাশি বৈশ্বিক সংহতির ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

যে প্রযুক্তিগত বিকাশ ভৌগোলিক দূরত্বকে অপ্রাসঙ্গিক করে পুঁজির বৈশ্বিক বিস্তারকে বেগবান করেছে তা একই সঙ্গে বৈশ্বিক প্রতিরোধ ও চিন্তার আদান-প্রদানকেও সহজ করেছে। একদিকে যেমন পুঁজির আগ্রাসন বেড়েছে, বৈষম্য বেড়েছে, জাতি ধর্ম বর্ণ বিদ্বেষ বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি এসবের বিরুদ্ধে লড়াইও নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছে। পাঠ, চিন্তা, তত্ত্বচর্চা, সংগঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। শ্রেণীর পাশাপাশি লিঙ্গ, পরিবেশ, অভিবাসী বিষয় এখন বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রে।

যুক্তরাষ্ট্রের যে নির্বাচনে ট্রাম্পের মতো ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছেন সেই নির্বাচনেই ভিন্ন একটি চিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার নির্বাচনের মধ্যে বার্নি স্যান্ডার্স মিডিয়া ও ক্ষমতাবান অর্থ জোগানদারদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় একচেটিয়া পুঁজি, সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন যুদ্ধ বিরোধী কথা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক বিপবের কথা বলেছেন এবং বিপুল সমর্থনও পেয়েছেন। বলাই বাহুল্য, বার্নি স্যান্ডার্স একক বা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। এর পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে 'আমরা ৯৯%' শিরোনামে আগের কয়েক বছরের চিন্তা ও আন্দোলন। 'অকুপাই মুভমেন্ট' নামে পরিচিত এই আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণী লিঙ্গ বর্ণ ধর্ম নিপীড়ন ও বৈষম্য বিরোধী একটি প্রজন্ম তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তার গতি ও শক্তি এখনও অনেক দুর্বল।

প্রশ্নের মুখোমুখি

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যেভাবে ঘটেছে, সেটা বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলন তত্ত্ব চর্চার সঙ্গে জড়িত কেউ ধারণা করতে পেরেছিলেন তা বলা যাবে না, আমি অন্তত জানি না। কেন এই পতন ঘটল তার ব্যাখ্যা আমরা করেছি পরে, এবং বুঝতে চেষ্টা করেছি এর কারণ। পতনের আগে কয়েক দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে পরিচালিত হচ্ছিল তা বিশ্বব্যাপী আমরা অনেকেই গ্রহণযোগ্য মনে করিনি।[৯] তবে এই বিরোধিতা বা সমালোচনার মাত্রা বিভিন্ন রকম ছিল। এগুলো নিয়ে কখনো আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সুস্থ বা পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে বিতর্ক হয়নি।

আগেই বলেছি, সোভিয়েত ইউনিয়নের লাইন নিয়ে প্রথমে আলবেনিয়া এবং পরে চীন সমালোচনা উত্থাপন করে ষাটের দশকের প্রথমেই। খুব বেশিদিন যায়নি, অল্পদিনের মধ্যেই সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ক্রমে তা চীন ও আলবেনিয়ার প্রতি এমন বৈরী হয়ে ওঠে যে তাদের শত্রুপক্ষ হিসেবেই বিবেচনা করতে থাকে। প্রতিক্রিয়ায় চীন যে অবস্থান নেয় তাতে ক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতেও বড় শত্রু। অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও বিপবীদের মধ্যে একই রকম ঘটনা ঘটে। নিজেদের বোধবুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে এসব বিষয় সমালোচ না ব্যতিরেকেই মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী হিসেবে ভাগ হয়ে যায় বিপবীরা এবং পরস্পরকে ভয়ংকর শত্রু হিসেবে গণ্য

৯। ১৯৮০-৮১ সালে কাজী নূরুজ্জামান সম্পাদিত সাপ্তাহিক নয়া পদধ্বনিতে 'সোভিয়েত অর্থনীতির রূপান্তর এবং সমাজতন্ত্র' নামে প্রকাশিত আমার একটি ধারাবাহিক লেখায় সোভিয়েত পথ নিয়ে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির একটি পরিচয় পাওয়া যাবে। পুস্তিকা হিসেবে এটি প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। সত্তরের দশক থেকে বাংলাদেশেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' নামে আখ্যায়িত করা চালু হয়েছিল চীনের অনুসরণে। এই আখ্যানের যথেষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল বলে আমার কখনোই মনে হয়নি, সেই সময়ের লেখায়ও তাই আমি এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করিনি। এই লেখায় সোভিয়েত বিপ্লবের পরও সেখানে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যে সম্ভব আমি সে বিষয়টিই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম। তবে অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন এভাবে ভেঙে পড়ার কথা ভাবিনি। গর্বাচেভ আমলে সোভিয়েত পার্টি নবায়ন নামে সরাসরি সমাজতন্ত্রবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। সে সময় সংস্কৃতি প্রকাশনী থেকে আমরা 'স্ট্যালিন প্রশ্ন' নিয়ে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেছিলাম, যা সম্পাদনা করেছিলেন বদরুদ্দীন উমর। সেখানে আমি লিখেছিলাম বিপ্লব-উত্তর রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক গঠনকালের বিবিধ সমস্যা বিতর্ক, স্ট্যালিন সময়কালের অর্জন ও সংকট এবং পরবর্তীকাল। গর্বাচেভ সময়কালে 'গাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রোইকা'র যৌক্তিক ধারাবাহিকতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে। এবং পরে এর কারণ অনুসন্ধান চেষ্টায় আরও লেখা তৈরি হয়।

করতে থাকে।

চীনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার পুনরাবৃত্তি ঘটে, যখন আলবেনিয়া চীনের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ভূমিকার সমালোচনা করে। চীন ও আলবেনিয়ার সম্পর্কও একই রকম দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালে চীনের ভ্রান্ত ও দায়িত্বহীন ভূমিকা বাংলাদেশে চীনপন্থীদের একটি বড় অংশকে বিপর্যস্ত ও দিগ্‌ভ্রান্ত করে। এই সময় থেকেই চীনের রাজনীতি, আন্তর্জাতিকতা ও উন্নয়ন দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে থাকে। চীন বর্তমানে যে পথ ধরেছে তা পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং তারা নিজেদের পথ ও পদ্ধতিকে অভিহিত করছে 'বাজার সমাজতন্ত্র' নামে। উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে চীনের আবির্ভাব পুঁজিবাদী বিশ্বে এক বিস্ময়। একই সঙ্গে তা নতুন এক প্রপঞ্চ।

যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে ছিল, ততদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী রাজনীতি ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা যেভাবে কাঠামোবদ্ধ ও প্রশ্নাতীত ছিল এখন আর তা সেভাবে থাকতে পারছে না। বিপ্লবী রূপান্তরের সংগ্রামে কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এখন এমন অনেক প্রশ্ন মোকাবেলা করতে হচ্ছে, যেগুলো ১৯৯০-এর আগে উত্থাপিত হয়নি। প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য তৈরি বা গ্রাহ্য কোনো কেন্দ্রও এখন নেই। লড়াইয়ের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ হিসেবে কিংবা সমাজতন্ত্রের মডেল হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনের নাম বলে কথা শেষ করে দেবার পরিস্থিতিও এখন নেই। কারণ সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তো নেই-ই, খোলস থাকলেও সেই চীনও আর টিকে নেই।

বিপ্লবী রাজনীতি, মুক্তির রাজনীতি এখন তাই অনেক প্রশ্নের সামনে। সমালোচনার সামনে। সংশয়ের সামনে। অনেক বড় সম্ভাবনারও সামনে। প্রশ্ন বা সমালোচনা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া কোনো কাজের কথা নয়, এমনকি তা যদি অর্থহীন বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও হয়। কেননা যাকে মনে হয় উড়িয়ে দেয়া হলো, তা অনেক সময় উড়ে যায় না, রয়ে যায় মনে, এমনকি উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত যে মানুষ তাকেও তা একসময় দখল বা পরাজিত করতে পারে। সেজন্য মুখোমুখি হওয়া ভালো। মুখোমুখি হয়েই কেবল চলার পথ যাচাই ও ঠিকভাবে নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন কারো মনে উত্থাপিত না-ও হতে পারে। কাল এবং পরিস্থিতি পূর্বের অনেক সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনার তাগিদ দিতে পারে। প্রশ্ন ভেসে বেড়াতে পারে বাতাসে, কিংবা থাকতে পারে তরল অবস্থায়। উপেক্ষা করে গেলে বা চোখ-কান বন্ধ করে থাকলে আপাত দৃষ্টিতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ক্ষতি আখেরে। কারণ সকল প্রশ্নই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিরসন হয় না বা মুছে যায় না। অনেক প্রশ্ন দিনে দিনে আরও সবল হয়। একইকারণে সম্ভাবনার দিকগুলো উপেক্ষা করাও আত্মঘাতী।

সোভিয়েত অর্থনীতির বিনির্মাণে সাফল্য ও ব্যর্থতা, অগ্রসরতা ও পশ্চাদপসরণ, জনগণের জীবনমান নিরাপত্তা ও পার্টির কর্তৃত্ব, শক্তি ও দুর্বলতা–সবকিছুই এখন মানুষের অভিজ্ঞতার অংশ, সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ। লেনিনসহ রুশ বিপ্লবীরা যে রকম অজানা পথে পাড়ি দিয়েছিলেন, আমাদের অবস্থা সে রকম নয়। তুলনায় আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। দেখতে চাইলে আমাদের পক্ষে বিস্তৃতভাবে দেখা সম্ভব যে কী কী করা জরুরি আর কী কী করা মোটেই যাবে না। কী কী সংকট বা প্রতিবন্ধকতা ভেতর থেকে আসতে পারে, আর কী কী আসতে পারে বাইরে থেকে।

সুতরাং প্রশ্নের উত্তর আর লড়াইয়ের লক্ষ্য হিসেবে ভবিষ্যৎ সমাজের একটি গ্রাহ্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য ছবি আমাদের নিজেদেরই নির্মাণ করতে হবে। সে কারণে পুরনো কাঠামোবদ্ধ ও নিশ্চিত উত্তরমালা দিয়ে কোনো কাজ হবে না। এর মধ্যে অনেক ধরনের পরিবর্তনের তাগিদ তৈরি হয়েছে। নিজেদের বিশ্লেষণের প্রস্তুতি ও সক্ষমতা দরকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতি আপাত দৃষ্টিতে খুব জটিল, আবার একই সঙ্গে বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ। এই সময় পর্যালোচনার। এই সময় নতুন সৃষ্টির। আগের সৃষ্টির সাথে নতুন যোগের। বস্তুত খুবই সৃজনশীল সময় এখন।

এরিক হবসবম বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে মার্কসের শৃঙ্খলমুক্তি ঘটেছে। (হবসবম, ২০১১) কীভাবে? গত একশ বছরে মার্কস, পুঁজি, সমাজতন্ত্র, বিপব নিয়ে উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক কাজ কী কী হলো? মতভেদ, মতৈক্য ও বিতর্ক কেমন? কতিপয়ের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাকে আমরা সমাজতন্ত্র বলে মানতে রাজি নই। সে কারণে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে তা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মডেল নয়। তাহলে ভবিষ্যতের সমাজের চিত্র কেমন হবে? আর মুক্তির লড়াই কী কী নতুন ভাষা যোগ করছে? এসব বিষয়ে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত।

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anujuniv@gmail.com

তথ্যসূত্র:

আমিন, ১৯৯২। Samir Amin: Empire of Chaos, MR.

হবসবম, ২০১১। Eric Hobsbawm: How to Change The World, Abacus, London.

পেট্রাস, ২০১২। James Petras: The Great Transformation: From the Welfare State to the Imperial Police State, http://petras.lahaine.org/?p=1903

ফুকুয়ামা, ১৯৯২। Francis Fukuyama: The End of History and The last Man, Free Press, US, 1992

ম্যান্ডেল ১৯৭৬। Ernest Mandel: The Late Capitalism, Verso.

মুহাম্মদ, ১৯৯২। আনু মুহাম্মদ : অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র : সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা, প্রতীক, ঢাকা।

মুহাম্মদ, ১৯৯৩। আনু মুহাম্মদ : পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাবি।

মুহাম্মদ, ২০০৩। আনু মুহাম্মদ : বিশ্বায়নের বৈপরীত্য, শ্রাবণ, ঢাকা।

মুহাম্মদ, ২০০৭। আনু মুহাম্মদ : বিপবের স্বপ্নভূমি কিউবা, শ্রাবণ, ঢাকা।

মুহাম্মদ, ২০১০। আনু মুহাম্মদ : পুঁজির অন্তর্গত প্রবণতা, সংহতি, ঢাকা।

রেজিস্টার, ২০১৫। Socialist Register 2016. Ed by Leo Panitch and Greg Albo, Merlin Press.